Downloaded from: justpaste.it/History_of_Jihadi_Tanjim

A Review on Jihadi Tanjim in Bangladesh

A Review of the History of Jihadi Tanjims in Bangladesh

বাংলাদেশের জিহাদী কার্যক্রমের ইতিহাসের ব্যাপারে যারা সামান্য জ্ঞান রাখেন তারা জানেন,

এই ভূমিতে জিহাদি তানযিমগুলোর প্রায় ৩০ বছরের (১৯৯২ - চলমান) সশস্ত্র জিহাদের ইতিহাস রয়েছে।

এই তিন দশকে বাংলার জণগণ একাধিক তানজিমের উত্থান-পতন দেখেছে। প্রতিটি তানজিমই বিচিন্ন রকমের কর্মসূচী উপস্থাপন করেছে।

কিন্তু বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশের মুসলমানদের উপর ক্রমবর্ধমান নির্যাতন ও ইসলামবিদ্বেষী আগ্রাসন এদেশের জিহাদী তানজিমগুলোর দিকে বার বার একটি প্রশ্ন উপস্থাপন করছে।

সম্প্রতি কুমিল্লার ঘটনার ফলে প্রশ্নটি আবারও নতুন করে উত্থাপিত হতে শুরু করেছে।

আর সে প্রশ্নটি হচ্ছে, বাংলাদেশের ইসলামী গণ আন্দোলনের ক্ষেত্রে জিহাদী তানজিমগুলোর প্রাসঙ্গিকতা কোথায়?

এই প্রশ্নটির উত্তর অনুসন্ধানের দিকে নজর দিলে কয়েকটি কারণ পরিলক্ষিত হবে।

যার মধ্যে একটি কারণ হচ্ছে, এই দেশের তানজিমগুলো জনসম্পৃক্ততার তুলনায়, তানজিমের একটি আলাদা অস্তিত্ব তৈরি বা রক্ষা করতেই বেশি আগ্রহী।

এই কথার বাস্তবতা অনুধাবনের জন্য, হুজির ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা এবং জেএমবি দেশব্যাপী সিরিজ বোমা হামলা উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে।

হুজির ধারণা ছিল তারা একটি রাজনৈতিক শূণ্যাবস্থা তৈরি করার মাধ্যমে,
তাদের জিহাদী কার্যক্রম বেগবান করতে পারবে অন্যদিকে সিরিজ বোমা হামলার মাধ্যমে জেএমবি সারা দেশে গণদাওয়াতের পরিকল্পনা করেছিলেন।

যা পরবর্তীতে তাদের আন্দোলনকে আরো গতিশীল করবে।

অর্থাৎ, উভয় সংগঠন তাদের আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য জনগণকে ব্যবহার করেননি।
বরং, তারা এই হামলারগুলোর মাধ্যমে নিজেরাই একটি সুযোগ সৃষ্টি করেতে চেয়েছেন এবং এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আন্দোলনকে গণমুখী করতে চেয়েছেন।

কিন্তু রাসূল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হুদাইবিয়ার সন্ধির দিকে তাকালে দেখতে পারবো, তিনি তার রাজনৈতিক ও সামরিক প্রজ্ঞার ভিত্তিতে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, মুশরিকরা কখনোই এই দীর্ঘ সময় সন্ধির শর্তের উপর দৃঢ় থাকতে পারবে না।

তাই, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া'সাল্লাম) শুধুমাত্র একটি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন।
যাতে তিনি মক্কার মুশরিকদের কোনঠাসা করতে পারেন।

বনু খুযাআ গোত্রের উপর বনু বকর-এর আক্রমণ সে সুযোগ তৈরি করে দেয়।

এমনকি তিনি আবু সুফিয়ানের চুক্তি নবায়নের আবেদনটি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেন।

যাতে সৃষ্ট সুযোগকে পরিপূর্ণভাবে প্রয়োগিক রূপ দেওয়া যায়।
অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পদ্ধতি হলো,

"জিহাদি ও রাজনৈতিক কার্যক্রম এক ধাপ এক ধাপ করে এগিয়েছেন। এবং সর্বদাই সৃষ্ট সুযোগের ক্ষেত্রে সজাগ ছিলেন।

যাতে হঠাৎ কোন সুযোগ তৈরি হলে সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে জিহাদী কার্যক্রমকে আরো বেগবান করতে পারেন।"

অনুরূপভাবে, আমেরিকানদের বিরুদ্ধে তালেবানদের আন্দোলনকে বিশ্লেষণ করলে সে একই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি পাওয়া যাবে।

তালেবান মুজাহিদরা ২০ বছর ধরে তাদের জিহাদ জারি রেখেছিলেন।

শহর অঞ্চলে তাদের কর্মতৎপরতা না থাকলেও অধিকাংশ গ্রাম অঞ্চল তাদের আয়ত্তে ছিল।

কিন্তু তারপরও তালেবান নেতৃত্বস্থানীয়রা কাবুলের দিকে মার্চ করেননি। বরং, তারা সঠিক সুযোগ এবং পরিস্থিতির সন্ধানে ছিলেন।

আফগান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার নেতৃত্বস্থানীয়দের সেই সুযোগ তৈরি করে দেয়। মুহূর্তের কালক্ষেপণ না করে তালেবান মুজাহিদরা সৃষ্ট পরিস্থিতি আর সুযোগকে কাজে লাগান।
একের পর এক প্রদেশ বিজয়ের মাধ্যমে তারা সারা আফগানিস্তানে তাদের বিজয়ের পতাকা উত্তোলন করেন।

হুজি ও জেএমবি'র সম্মানিত ভাইয়েরা,
জিহাদি পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি আমলে নিতে হয়তো ভুলে গিয়েছিলেন।

তাই উল্লেখিত ঘটনাদ্বয় থেকে তানজিমগুলো কোন ফায়দা তো নিতেই পারলো না; বরং এমন জিহাদী কার্যক্রমের ফলে হিতে বিপরীত হয়ে গেল।
দ্রুতই তারা জনগণের সমর্থন হারাতে শুরু করলেন।

প্রশাসন আর আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তানজিমগুলোর উপর এমন চাপ প্রয়োগ করা শুরু করলো যে,
হুজি ও জেএমবি শুধুমাত্র তাদের আসকারী কার্যক্রম নয়; বরং তাদের দাওয়াতি কার্যক্রমও স্থগিত করে দিতে বাধ্য হলেন।

বাংলাদেশ হচ্ছে এমন এক সমতলভূমি, যেখানে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে প্রত্যন্তাঞ্চলে দীর্ঘমেয়াদী গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করা অসঅসম্ভ
এরকম একটি ভূমিতে জনগণকে ব্যবহার না করে শুধুমাত্র একের পর এক ঝটিকা আক্রমণের মাধ্যমে বা গতানুগতিক দাওয়াতি কাজের মাধ্যমে কোনো আন্দোলন তৈরি করা বা বেগবান করা অসম্ভব।

এটাই এদেশের জিহাদী তানজিমগুলো অনুধাবন করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

তানজিমগুলোর গণআন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত না হওয়ার আরেকটি কারণ হতে পারে যে, এদেশে চলমান দাওয়াতী কার্যক্রমের তত্ত্বমতে-

বাংলাদেশের জিহাদী আন্দোলন আফগান বা অন্য কোন জিহাদি বহিঃশক্তির উপর নির্ভরশীল।

সহজ ভাষায় বলতে হলে রাজনৈতিক অবস্থান অনেকটা এমন,
এদেশের মাটিতে দাওয়াতি কার্যক্রম চলতে থাকবে, যাতে প্রচুর আনসার তৈরি করা যায়।

পরবর্তীতে বিজয়ী আফগান, পাকিস্তানী বা কাশ্মিরী মুজাহিদরা বাংলার মুসলিমদের সাহায্য করার জন্য এবং এই ভূমির জিহাদকে গতিশীল করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশমুখী হবেন।

কিন্তু আদৌ কি এটা সম্ভব? কমপক্ষে ইতিহাস তো আমাদের সেই শিক্ষা দেয় না।

যদি শায়খুল হিন্দ (রাহিঃ)-এর আন্দোলন তথ্য ফাঁসের কারণে ব্যর্থ না হতো; তাহলে, এই মিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল আফগানিস্তানের আমিরকে ব্রিটিশ ভারতের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার জন্য রাজি করা এবং আফগান সরকারের কাছ থেকে চলাচলের জন্য আফগান করিডোর ব্যবহারের অনুমতি লাভ করা।

যাতে এই আন্দোলনের কর্মীদের পাশাপাশি উসমানীয়, জার্মান ও আফগানিস্তানী সৈন্য, রসদ, অস্ত্র ও অন্যান্য সহায়তা ভারতীয় উপমহাদেশের সীমানার সন্নিকটে নিয়ে আসার বা সীমানার ভিতরে প্রবেশ করানো করা যায়। যা এই আন্দোলনের সফলতা অর্জনের সম্ভাবনা আশংকাজনক হারে হ্রাস করেছিল।

কেননা, এত বড় বাহিনী মবিলাইজ করা একে তো অনেক বড় একটি সমস্যা; তার উপর এই কাজ গোপনে করা- প্রায় অসম্ভব একটি কাজ।

একথা অনস্বীকার্য যে, শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান (রাহিঃ), উবাইদুল্লাহ সিন্ধি (রাহিঃ)-রা বর্তমান প্রজন্মের আকাবীর।

তাদের অনুসরণ করা বর্তমান প্রজন্মের জন্য কাম্য তাদের জীবনের প্রতিটি পর্যায় থেকে শিক্ষনীয় অনেক কিছু গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

যেমন তাদের চরিত্র থেকে, চিন্তাধারা থেকে, লেখনী থেকে, সাফল্য থেকে এবং ব্যর্থতা থেকেও।

কিন্তু বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের রূপকাররা আকাবিরদের প্রতি সম্মানের জন্যই হোক বা নিজেদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অভাবেই হোক তারা শায়খদের পরিকল্পনার ত্রুটি থেকে শিক্ষা নিতে নারাজ।

ভালোভাবে লক্ষ্য করলে অনুধাবন করা যায় যে, বাংলাদেশের জিহাদী আন্দোলনের একটি অংশের দাওয়াত,
শায়খুল হিন্দ (রাহিঃ)- এর রেশমি রুমালের আন্দোলনের ধাচের উপর দাঁড়ানো।
অথচ, "অতীতের যে কোন সময় থেকে বর্তমানে সিন্ধু-> পাকিস্তানের দুটি সমতল ভূমির শহরাঞ্চল-> পাঞ্জাব-> বিহার অতিক্রম করে বাংলায় উপস্থিত থেকে অপারেশনাল কার্যক্রম চালানো শুধু আফগান মুজাহিদদের কেন অন্য যে কোন দেশের মুজাহিদদের পক্ষেও সম্ভব না।
যদি কাশ্মীর বিজিত হয়, তাও সেদিক থেকে দিল্লী, হরিয়ানা সহ কয়েকটি প্রদেশ অতিক্রম করে বাংলাদেশ অবধি আসা, বাস্তবতা বিবর্জিত একটি চিন্তা।"

তাই বাস্তবতা কি বলছে তা বুঝার চেষ্টা করা উচিৎ। ভারত আগের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য নিয়ে গঠিত না যেখানে কোন রাজ্যকে বিজয় করে, কোন রাজ্যকে উপঢৌকন দিয়ে বা কোন রাজ্যের সাথে চুক্তি করে উপমহাদেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বাহিনী মবিলাইজ করা যাবে

বরং, আজকের ভারত একটি সংগঠিত রাষ্ট্র।

এখানে যে কোনো একটি প্রদেশের করিডোর ব্যবহার করাও, তারা তাদের সার্বভৌমত্বের উপর আঘাত হিসেবে গ্রহণ করবে।

শুধু ভারত কেন পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও একই নীতি প্রযোজ্য।

তাই, জিহাদি তানজিমগুলোর এমন চিন্তাধারার উপর দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করা, সাধারণ মুসলিমদের সাথে ধোকা করার সামিল।

উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর হিসেবে প্রস্তাবিত সমাধান হচ্ছে, "বর্তমান সময়ে বাংলার মাটিকে সুযোগ্য, বিচক্ষণ নেতৃত্বের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

যিনি সাধারন মানুষের মিছিল থেকে তাদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসবেন।

বিক্ষোভরতদের জন্য আন্দোলনের পথ তৈরি করবেন। আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে দিবেন।

মোটকথা, এমন এক নেতৃত্ব প্রয়োজন, যিনি সৃষ্ট পরিস্থিতিকে ব্যবহার করবেন আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য; আন্দোলনকে তার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য।"

নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মাঝে এই নির্দিষ্ট গুণের দাবি, আমাদের সামনে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করে। তা হচ্ছে, বাংলাদেশে কি এমন কোন নেতৃত্বস্থানীয় ব্যাক্তি বা ব্যাক্তিবর্গ আছেন যারা গণরোষকে গণআন্দোলনে পরিবর্তন করতে পারবেন,*

যার ফলে প্রয়োজনীয় অরাজকতা আমাদের জন্য সম্ভাব্য পরিস্থিতি এনে দিবে? পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশে জিহাদি তানজিমগুলো বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি উপস্থাপন করেছে।

সাম্প্রতিক সময়ে আল কায়েদা বাংলাদেশ ২০১৫ সালে 'খতমে মুলহিদিন আন্দোলন'-এর মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে জনমনে ব্যাপকভাবে জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়,

যদিও তা এখন কিছুটা স্তিমিত হয়তো। মানহাজের এত ভিন্নতা এবং কর্মপদ্ধতির এত বৈচিত্র্যতা প্রমাণ করে যে,

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বিবেচনা সাপেক্ষে জিহাদের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নিয়ে চিন্তা করার মতো ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব জিহাদি তানজিমগুলোর রয়েছে।

যদিও হুজি ও জেএমবি-এর দাওয়াতি ও আসকারী কার্যক্রম স্থগিত বা স্থবির।* কিন্তু খতমে মুলহেদিন আন্দোলন আজও বাংলা সাধারণ মুসলিমদের অন্তরকে নাড়া দেয়।

এই আন্দোলনের নেতা ও পুরোধাদের দিকে আজো এজাতির সাধারণরা তাকিয়ে আছে।

আর বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলার জিহাদকে বিশেষ করে সরকারের ইসলাম বিদ্বেষী আন্দোলনকে গণবিপ্লবে পরিণত করার জন্য এই আন্দোলনে নেতৃত্বস্থানীয়দের দিকনির্দেশনা একান্ত প্রয়োজন এটা আবেগ নয় বরং যুক্তির কথা।

ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ২০১৩ সালের হেফাজতের লংমার্চ থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে যে কয়টি জনবিক্ষোভের সূচনা হয়েছে তার কেন্দ্রে ছিল, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কটুক্তি নতুবা ইসলাম ও কুরআনের অবমাননা করার মত ন্যাক্কারজনক ঘটনা। নাউজুবিল্লাহ!!

আর খতমে মুলহেদিন আন্দোলন এপরিস্থিতির দাবীকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগিয়ে কোটি জনতার অন্তরে স্থিরতা এনে দেয় এবং গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে।

তাই আশা করা যায়, এই আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়রা সহজেই জনবিক্ষোভগুলোর আবেগ ও আবেদনকে অনুধাবন করতে পারবেন

ইনশাআল্লাহ।

আরো আশা করা যায়, তারা জনসাধারণের বিক্ষিপ্ত দাবিকে একটি নীতিমালা প্রদান করতে পারবেন। এবং, বাকি জামাতগুলোর পক্ষে যদি এই মহান দিকপালদের অধীনস্ততা গ্রহণ সম্ভব নাও হয়, নিদেনপক্ষে তাদের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা জানা ও মানাকে নিজেদের জন্য আবশ্যক করে নিবেন হতে পারে নিরাপত্তার খাতিরে এ আন্দোলনের রূপকারগণদের আমরা এখন নিরব দেখছি।

এব্যাপারে আমিও একমত যে, বাংলাদেশের মতো পটভূমিতে নিরাপত্তা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

বিশেষ করে এই পর্যায়ের নেতৃত্বস্থানীয় জন্য নিরাপত্তার সামান্যতম ঘাটতি অত্যন্ত ক্ষতির কারণ হতে পারে।

কিন্তু আমি আশা করি নিরাপত্তার নামে নিষ্ক্রিয়তা কখনোই কাম্য নয়।

এখানে নিস্ক্রিয়তা বলতে আমি বোঝাচ্ছি সুযোগ হাতছাড়া করা। আমার আবেদন হচ্ছে,

They must come out of Shadow to Merge with the Mass.*

তাদের নিরাপত্তার খোলস থেকে বের হয়ে আসতে হবে। দেশে চলমান গণবিক্ষোভগুলোকে সমর্থন দিতে হবে।

শুধু মৌন সমর্থন নয়; বরং পরামর্শ ও দিকনির্দেশনার সমর্থন।*

এই মহান নেতাদেরই ভাবতে হবে, নিরাপত্তা নিশ্চিত রেখে সমান্তরালভাবে জনবিক্ষোভের সাথে একত্রিত হওয়া সম্ভব কি না

সম্ভব হলে- কিভাবে সম্ভব, পদ্ধতি কি হবে বিষয়গুলো বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে।

(যা পর্যায়ক্রমিকভাবে অন্য লেখনীতে আলোচনার চেষ্টা করা হবে)। তাই, আল্লাহর এই জমিনে জিহাদের কার্যক্রমকে গতিশীল করতে এবং সাধারণ জনগণকে জিহাদের বিশাল কর্মযজ্ঞে শামিল করতে নেতৃস্থানীয়দের এগিয়ে আসতে হবে,

যাতে হঠাৎ সৃষ্ট এই জনরোষকে অবিরাম আন্দোলনের রূপ দেওয়া যায়।

কারণ এমন না হলে, বাংলার মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেওয়া প্রতিটি অন্যায়-অত্যাচার বা আগ্রাসন বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবেই ইতিহাসের পাতায় স্থান পাবে।

আর প্রতিটি বিক্ষোভ পর শহীদের মিছিল দীর্ঘায়িত হবে; কিন্তু আমাদের অর্জন হবে 'শূন্য'।